ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৫

(মুহাম্মাদ সা. ও সাহাবিদের জীবনী)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

সর্বশেষ বার্তাবাহক

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চেহারা ১৫
কুরাইশ কারা ছিল ২০
মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ২৫
যুবক এক ব্যবসায়ী ৩২
আল্লাহ কীভাবে তাঁর নবিদের বাছাই করতেন ৩৮

অধ্যায়-২

সংগ্রামের সূত্রপাত

সর্বাগ্রের সেনানীরা ৪৯
মক্কাবাসীর নির্যাতন ৫৬
আবিসিনিয়ায় হিজরত ৬৭
আকাবার শপথ ৮২

অধ্যায়-৩

মুসলিম জাতির আবির্ভাব

নতুন যুগে প্রবেশ ৯১
একটি শহরের পুনর্নির্মাণ ১০০
বদরের যুদ্ধ ১০৭
উহুদের যুদ্ধ ১১৫
আবারও ঝড়ের পূর্বাভাস ১২৫
এবার মদিনা অবরোধ ১৩১

অধ্যায়-৪

চূড়ান্ত বিজয়

মক্কা যেভাবে মুক্ত হলো	১৪৭
হুনাইন ও তাবুক	১৬২
দায়িত্বের পরিসমাপ্তি	১৭৭
নবিজির প্রতিচ্ছবি	১৮৪
উম্মে সালামা (রা.)	১৯৫
মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)	২০২
বিড়ালছানার ভক্ত যিনি	২০৬
ফাতিমা (রা.) : অমূল্য যে রতন	২১১
সালমান আল ফারসি (রা.)	২১৯
জুলাইবিব (রা.)	২২৭
আবু জর আল গিফারি (রা.)	২৩১
আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)	২৪০
আরও কয়েকজন সম্মানিত সাহাবি	২৪৭

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চেহারা

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—একটি সভ্যতার অর্জিত সফলতা ছাপিয়ে যেতে আরও যে সকল সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকতে হয়।

ইসলাম কী

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের যেসব স্থানে মনুষ্য বসতি করে–এমন সব অঞ্চল ছিল সাম্রাজ্যগুলোর অধীনে। আর সাম্রাজ্যগুলো পরিচালিত হচ্ছিল স্বৈরাচারী ও আগ্রাসী শাসকদের দ্বারা। পশ্চিমা রোমান সভ্যতা নানাদিক থেকে বারবারিকদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর এশিয়া মাইনরের বিশাল এলাকাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাইজেন্টাইন রোমানদের একক আধিপত্য। মধ্যপ্রাচ্যে ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাব, যা প্রাথমিকভাবে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হলেও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার সীমানাঘেঁষে পৌঁছে গিয়েছিল ফিলিস্তিন পর্যন্ত।

অন্যদিকে ভারতবর্ষ অনেকগুলো রাজ্যে বা প্রদেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। চীনে চলছিল হান রাজবংশের শাসন। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের কারণে ততদিনে চীনা রাজবংশের শাসনেও নৈরাজ্য আর ফাটল দেখা দিয়েছিল। তবে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড়ো বিভেদ ও সংঘাত ছিল বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে। বাইজেন্টাইনরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিল খ্রিষ্টান আর পারসিকরা ছিল জরথুস্ত্র অর্থাৎ অগ্নিপূজারি। প্রায়শই এ দুই পরাশক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে যেত। একে অন্যের ভূখণ্ড দখল করার কিংবা কৌশলগত ফায়দা হাসিল করার চেষ্টার অন্ত রাখত না।

বেশিরভাগ সময় এ দুই পরাশক্তির যুদ্ধ হতো সিরিয়া, আর্মেনিয়ায় কিংবা ফিলিস্তিনে। শত শত বছর ধরে এ দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছিল। কোনো একটি যুদ্ধে হয়তো একপক্ষ জিতত, আবার আরেক যুদ্ধে হয়তো অন্যপক্ষ। তবে এসব যুদ্ধের পরিণতিতে এই সাম্রাজ্যগুলোর শহর আর জনজীবনের পরিণতি হয়ে উঠত অত্যন্ত নাজুক ও বিষাদময়।

স্থবিরতা থেকে শিক্ষা

তৎকালীন সময়ের পরাশক্তিগুলো যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কাজেই সিংহভাগ সম্পদ ব্যয় করত। তাই এ সাম্রাজ্যগুলোর অন্যান্য স্বাভাবিক কার্যক্রম বিশেষ করে স্কুল পরিচালনা, চিত্রশিল্পী, পড়াশোনার মতো কাজের জন্য তেমন কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হতো না। ফলে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই লিখতে-পড়তে পর্যন্ত জানত না।

তাদের কাছে বইপুস্তক খুবই বিলাসী ও মূল্যবান পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে সমৃদ্ধশালীরাই কেবল বই পড়ার সুযোগ গ্রহণ করত। স্কুল-কলেজেও ধনীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হতো। আর যারাও-বা স্কুলে যেত, কেবলই সীমাবদ্ধ থাকত ধর্মীয় শ্লোক ও সামান্য আচারাদি শিক্ষায়। কিশোরী বা মহিলাদের জন্য শিক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ মোটেই ছিল না।

নিত্যনতুন যা আবিষ্কৃত, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। গণিত বা নগর পরিকল্পনায় নতুন কোনো চিন্তায় কারও আগ্রহ ছিল না; বরং জব্দকৃত সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় স্টিল নির্মাণ কৌশল নিয়ে তৎকালীন রাজা-বাদশাহ বা সমরপতিদের আকর্ষণ ছিল।

পড়াশোনা বা অধ্যয়নের প্রক্রিয়াও হয়ে পড়েছিল একদম স্থবির। ভবিষ্যৎও ছিল বড্ড আঁধারে ঘেরা, অস্পষ্ট। মানবাধিকার বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না তেমন কোনো আইন-শৃঙ্খলা। ডাকাত বা জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য ছিল আশঙ্কাজনক। স্থানীয় নেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো লোকজনের কাছ থেকে উচ্চহারে কর আদায় করে নিত।

খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা

তৎকালীন সময়ে খ্রিষ্টধর্ম প্রধানত ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও ফিলিস্তিনে বিকশিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ স্থানেই খ্রিষ্টধর্ম যেভাবে পালিত হতো, তার সাথে ঈসা (আ.) প্রচারিত শিক্ষার তেমন কোনো সাদৃশ্য ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্টধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করত ইচ্ছেমতো। ইচ্ছে হলেই বানিয়ে নিত নতুন নতুন সংঘ বা গির্জা। রোমান অধিপতিরা নানা স্থানে ক্যাথলিক চার্চ নির্মাণে সহযোগিতা করত। উল্লেখ্য, ক্যাথলিক শব্দের অর্থ হলো সর্বজনীন।

ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের ৪শ বছর পর। এই চার্চগুলোতে অনুশীলন ও অনুসরণ করা হতো পলের শিক্ষার আলোকে ত্রিত্ববাদের রীতিনীতি। ক্যাথলিক চার্চগুলোতে শেখানো হতো যে, ঈশ্বরের তিন রূপের বিস্তারিত বিবরণও সেই বিশ্বাস মজবুতকরণ।

প্রথমদিকে চার্চে বিশ্বাসীরা আরও কিছু অদ্ভুত ধারণায় বিশ্বাস রাখতেন। যেমন : শুধু চার্চের আনুষ্ঠানিক সদস্যরাই স্বর্গে যেতে পারবেন। তারা আরও মানতেন, চার্চগুলোর প্রধান অর্থাৎ পোপ

হিসেবে যিনি দায়িত্বপালন করতেন, স্বর্গে যাওয়ার জন্য তার একনিষ্ঠ আনুগত্য করাও প্রয়োজন। তখনকার সময়ে বিশ্বাস করা হতো—পোপের সাথে ঈশ্বরের সরাসরি যোগাযোগ আছে এবং পোপ কখনোই ভুল করতে পারেন না। পোপ চাইলে যে কাউকে স্বর্গে বা নরকে পাঠাতে পারেন। যাজকরা মানুষের পাপ মোচন করারও ক্ষমতা রাখেন বলে তখন দাবি করা হতো।

৩২৫ সালে ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল সন্নিবেশিত হয়। যারা চার্চের আনুষ্ঠানিক প্রথা বা রীতিতে বিশ্বাস করত, শুধু তারাই বাইবেল পড়ার অনুমতি পেত; বাকি লোকেরা বাইবেল স্পর্শও করতে পারত না। তারা জানতও না যে, বাইবেল পড়ার নিয়মনীতি কী। শুধু যাজকরাই জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারতেন বাইবেলের আংশিক ব্যাখ্যা; যদিও তা মনগড়া। কিন্তু এর বাইরে জানার সুযোগও ছিল না জনসাধারণের।

চার্চে নারীদের অধিকার খুব সামান্যই বিদ্যমান ছিল। এখনকার সময়ের খ্রিষ্টান নারীরা যেমন বাইবেল একেবারেই মানে না, তখনকার সময়ে অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। তৎকালীন সময়ে বাইবেলের একটি নিয়ম ছিল—নারীরা চার্চের ভেতর কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে পারবে না। সোনা-রুপা, হীরে-জহরত, মুক্তা বা অন্য কোনো অলংকার পরিধান করতে পারবে না। মাথায় স্কার্ফ না পরে কোনো নারী চার্চে প্রবেশ করত না। তারা চার্চে কোনো পদে যেতে পারবে না। সব সময়ই নজর রাখা হতো, যাতে পদায়নের মাধ্যমে নারীকে যেন পুরুষদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা না দেওয়া হয়।[১]

এসব বিবরণ পড়েই জনসাধারণের ওপর ক্যাথলিক ও চার্চগুলোর প্রভাব বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া চার্চগুলো জনগণের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের কর আদায় করত এবং ওই টাকা দিয়ে চার্চের দায়িত্বশীলদের জন্য ক্যাথেড্রাল ও বিলাসী বাসভবন নির্মাণ করত। কেউ যদি চার্চ প্রদত্ত শিক্ষাসমূহ অমান্য করার কথা ভাবত, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কাফির বা অবিশ্বাসী তকমা দিয়ে তার ওপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার।

[১] করিনথিয়ানস : ১৪ : ৩৪-৩৫, ১১ : ১-১০ তিমোথি-২ : ৯-১৫

মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল সংকট ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে।

স্বপ্ন ও কুরবানি

মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মের বহু বছর আগের কথা। মক্কায় আবদুল মুত্তালিব নামে একজন ব্যক্তি ছিল। তিনি কুরাইশ বংশের একজন সদস্য, তবে আর্থিকভাবে ছিলেন দরিদ্র। তাঁর গোত্রের নাম বনু হাশিম। এই বনু হাশিমের হাতেই শহরে আগত বণিক-ব্যবসায়ী ও মুসাফিরদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমেই পানি শুকিয়ে যাওয়ার দরুন তারা বেশ সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল।

যে জমজম কূপ থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা পানি আহরণ করত, তা টানা কয়েক শতাব্দী ধরে নিঃসন্ধান ছিল। হয়তো মরুভূমির ঝড় বা যুদ্ধ বা অন্য কোনো দৈব দুর্বিপাকের কারণে কূপের মুখটি মাটি ও বালিতে আটকে গিয়েছিল। পানি না পাওয়ায় বনু হাশিমকে শহরের উপপ্রান্ত থেকে বেশ কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করতে হতো।

এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পাওয়ার জন্য আবদুল মুত্তালিব জমজম কূপটি পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিলেন। নানাজনের কাছ থেকে গল্প শুনে জমজম কূপের সম্ভাব্য অবস্থান নিয়ে আবদুল মুত্তালিবের কিছু ধারণা হয়েছিল। আর সে অনুযায়ী চেষ্টা শুরু করলেন তিনি। সন্তান আল মুগিরাকে নিয়ে তিনি গোটা মক্কার নানা স্থানে খনন করে গেলেন; কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও সুপ্রসন্ন হলো না তাঁর ভাগ্য।

একদিন রাতে ঘুমানোর পর তিনি স্বপ্ন দেখলেন—মক্কায় সবচেয়ে বড়ো দুটি মূর্তি যেখানে অবস্থিত, তার মাঝামাঝি একটি জায়গায় রয়েছে জমজম কূপটি। ঘুম থেকে উঠেই ছেলেকে নিয়ে ওই স্থানে গিয়ে শুরু করলেন খননকাজ। এভাবে খনন কাজ করতে করতে হঠাৎ অলৌকিকভাবে পেয়ে যান কূপের সন্ধান।

জমজম কূপটি পাওয়ার পর আবদুল মুত্তালিব অন্য একটি বিষয়ে বেশ উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়লেন। জমজমের কূপটির নিয়ন্ত্রণ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে চলে আসায় তিনি এর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে পেরেশানিতে পড়ে গেলেন। কেননা, তাঁর পরিবার ছিল ছোটো এবং যোগ্য তেমন কোনো

উত্তরসূরিও ছিল না। তাই তিনি অনুভব করলেন, এ কূপটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর একদল যুবক দরকার। তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—আল্লাহ যদি তাঁকে ১০ জন ছেলে সন্তান দান করেন, তাহলে কৃতজ্ঞতা হিসেবে তিনি একজন ছেলেকে কুরবানি করে দেবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, আরবরা মূর্তিপূজা করলেও তারা আল্লাহ নামটির সাথেও পরিচিত ছিল। তবে আল্লাহকে তারা মানবিক সান্নিধ্যের বা মানবিক বিষয়াবলির অনেক ঊর্ধ্বে বলে মনে করত। তারা মনে করত, মূর্তিরাই বরং তাদের জন্য বেশি সহায়ক এবং তারাই তুলনামূলক বেশি সৌভাগ্য নিয়ে আসতে পারবে।[২] সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া তৎকালীন মক্কার বাস্তবতায় বেশ দুরূহ ছিল।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুআ কবুল করেছেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ১০ পুত্র সন্তানের জনক হয়। যেহেতু ১০ জন ছেলে হলে একজনকে কুরবানি করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাই তিনি এ প্রতিশ্রুতি রাখতে বাধ্যও ছিলেন। কিন্তু যা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিলো, তা হলো—কাকে তিনি কুরবানি করবেন? তাঁর সবগুলো ছেলেই ততদিনে সাবালক হয়ে উঠেছিল আর তাঁদের কেউই জীবন হারাতে রাজি ছিল না। এ কারণে তিনি তাঁর ছেলেদের নাম দিয়ে পরপর তিনবার লটারি করলেন আর প্রতিবারই নাম এলো আবদুল্লাহর। আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রিয়তম সন্তান।

যাই হোক, আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এককথার মানুষ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। তাই তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। যদিও অনেকেরই তাতে ঘোর আপত্তি ছিল। কেননা, তাঁর সবগুলো ছেলের মাঝে আবদুল্লাহই ছিল সবচেয়ে সততা ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। তাঁরা এসে আবদুল মুত্তালিবকে বোঝাল, যাতে তিনি শিয়া নামক স্থানীয় ওঝা ও ধর্মযাজকের কাছে যান এবং তার কাছ থেকে বিকল্প কোনো সমাধান পাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করেন।

শিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবদুল্লাহ এবং ১০টি উটের মধ্যে লটারি বা নির্বাচন গুটিকা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নির্বাচনী গুটিকায় যদি আবদুল্লাহর নাম ওঠে, তাহলে ১০টি উটের সঙ্গে আরও ১০টি উট যোগ করে নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করতে হবে, যতক্ষণ না আবদুল্লাহর নামের স্থানে উটের নামটি আসে। তারপর উটের যে সংখ্যা নির্ধারক নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করা হবে, সেই সংখ্যক উট আল্লাহর নামে কুরবানি করতে হবে।

ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব উক্ত প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে পালন করে। আবদুল্লাহর নাম আসে ১০০তম উটের পরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর পরিবর্তে ১০০টি উট আল্লাহর নামে কুরবানি করেন।

---

[২] সূরা জুমার : ১-৩

মক্কাবাসীর নির্যাতন

একটু ভাবুন তো : *একজন মানুষ কখন, কীভাবে স্বৈরাচারী ও জালিম হয়ে ওঠে? একজন মানুষ যদি গরু বা কাঠের কোনো মূর্তির উপাসনা করে, আর আপনি তাকে এই বিভ্রান্তি বা ভ্রষ্টতা সম্পর্কে জানান, তাহলে সে কি আপনাকে আঘাত করতে পারে? এমন কিছু কি আপনি আদৌ প্রত্যাশা করেন? নির্যাতন করলেও কতটা সময় ধরে সে করবে? কতটা ভয়াবহ হবে ওই নির্যাতনের মাত্রা? যদি কেউ নিজ হাতে বানানো কাঠের কোনো মূর্তিকে নিজের প্রভু বলে মেনে নেয়, তাহলে তার চিন্তার গভীরতা বা প্রজ্ঞা কতটা গভীর বলে বিবেচিত হবে? সাধারণ অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতেই আপনি তার কাছ থেকে কতটুকুই-বা ইতিবাচকতা আশা করতে পারেন?*

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—মুহাম্মাদ (সা.)-কে যে রকম নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছিল।

দাওয়াতি কাজ

রাসূল (সা.) খুব ছোটো একটি গ্রুপের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি দুর্বল ও মজলুম মানুষদের মাঝেই দ্বীনি দাওয়াত প্রচার করেন। একদিন তিনি কাবার চত্বরে কিছু মানুষের সাথে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ে মক্কার কিছু প্রসিদ্ধ মানুষ সেখানে আসে।

মুহাম্মাদ (সা.) যেহেতু তুলনামূলক সমাজের নীচুস্তরের লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন, তাই মক্কার অভিজাত লোকেরা প্রাথমিকভাবে তাঁদের সাথে বসার আগ্রহ দেখায়নি। কারণ, তৎকালীন মক্কায় ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আভিজাত্য অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। তারা নবিজিকে বললেন—এসব দুস্থ লোকদের দূরে সরিয়ে দিতে, যাতে তারা কিছুটা সময় মুহাম্মাদ (সা.)-এর মুখ থেকে সরাসরি কিছু কথা শুনতে পারে।' তাদের বেশ আগ্রহও ছিল। অন্যদিকে, মুহাম্মাদ (সা.) নিজেও এ শহরেই মানুষ হয়েছিলেন।

তাই শহরের মানুষগুলোর চিন্তাধারা কীভাবে আবর্তিত হয়, তাও তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন। তিনি যখন কুরাইশ নেতাদের কথা রাখতে গিয়ে দুর্বল লোকদের সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, তখনই জিবরাইল (আ.) এসে তাঁকে কিছু ওহি শুনিয়ে গেলেন।

‘আর তাদের তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-বিকাল নিজের রবের ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন; নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।’[৩]

মুহাম্মাদ (সা.) এ আয়াতটি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করার পর অভিজাত লোকেরা স্থানটি ছেড়ে চলে গেল। ইসলাম দরিদ্রদের অভিজাতদের সাথে একসাথে বসার সুযোগ দিয়েছে—এ সত্যটি তাদের ভীষণভাবে আহত করল। তারা যখন জানল যে কারও বংশ পরিচয়, আভিজাত্য বা সম্পদ নয়; বরং ব্যক্তির তাকওয়াই হলো তার মূল্যায়নের একমাত্র মানদণ্ড, তখনও তারা বেশ হোঁচট খেলো।

এভাবে তিনটি বছর দাওয়াতি কাজ করার পর মাত্র ৩০ জন বা এর কিছু বেশি লোক ইসলাম কবুল করলেন। তাঁরা নিয়মিতভাবে আরকাম নামক একজন সাহাবির বাসায় জমায়েত হতেন। সেখানে যারা জমায়েত হতেন তাঁদের মাঝে নারী-পুরুষ, দুর্বল, সচ্ছল—সব ধরনের মানুষ ছিলেন। তখনকার সময়ে ক্রমাগতভাবে ইসলামের শিক্ষাসংক্রান্ত আয়াতগুলো নাজিল হচ্ছিল। কুরআনও তখন ধীরে ধীরে একটি কাঠামোগত রূপ লাভ করছিল।

মক্কার মূর্তিপূজারিদের কানে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কর্মধারা ও নতুন নতুন চিন্তা-কৌশল ঠিকই কানে আসছিল, কিন্তু তখনও অবধি তারা এগুলোকে কোনো হুমকি বলে মনে করেনি। কেননা, তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর এগুলো নতুন একটা কিছু করার প্রয়াস, যা সময়ের ধারাবাহিকতায় আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। এমনকি অনেক মক্কাবাসী ইসলামের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কারণ, ইসলামকে তারা কিছু মানবিক গুণাবলির সম্মিলন বলে বিবেচনা করেছিল। তাদের কাছে ইসলাম মানেই ছিল ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া, নারীদের সাথে পুরুষের মতো করেই সমাচরণ করা, এতিমদের প্রতিপালন, মূর্তি ভাঙা, গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করা, প্রতিদিন কিছু নির্দিষ্ট ইবাদত করা এবং সততাকে একনিষ্ঠভাবে লালন করা।

কিন্তু ইসলামের শিক্ষাগুলো ছিল আরও অনেক বেশি ব্যাপক ও গুরুতর। মূর্তিপূজারিরা আধ্যাত্মিক আচারাদি হিসেবে একটি কাজই করত। তারা মূর্তির সম্মানে মাঝে মাঝে ছাগল বা দুম্বা বলি দিত। কিন্তু ইসলাম পরকালে পুনর্জাগরণের কথা বলে। দুনিয়ায় মানুষ যেসব কাজ করে যাবে কিংবা তাদের ঈমানের মান যেমন হবে, ওই অনুযায়ী তাদের জবাবদিহিও করতে হবে বলে ইসলাম সতর্ক করে দেয়। পরকালীন এ চিন্তাধারাটি তখনকার আরব সমাজে মোটামুটি অপ্রচলিতই ছিল।

[৩] সূরা আনআম : ৫২

প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ

রাসূল (সা.)-এর কাছে একবার ওহি এলো—'আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।'[৪] এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের কাজটি পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ প্রকাশ্যে মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজ শুরু করার বার্তা দেওয়া হয়।

এই হুকুম পালনের অংশ হিসেবে রাসূল (সা.) একরাতে আরবের সব সম্ভ্রান্ত লোকজন এবং নিজের আত্মীয়দের একটি ভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। এদের কারও কাছেই তিনি ইতঃপূর্বে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাননি। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি সকলের সামনে ইসলামের বার্তাটুকু প্রচার করলেন এবং মানুষকে তা মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন।

কিন্তু প্রবীণ কোনো ব্যক্তিই তা মেনে নেননি; বরং তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পাঁয়তারা করলেন। কিন্তু আলি (রা.) সেখানে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন এবং সকলের সামনে এককভাবে হলেও রাসূল (সা.)-এর সাথে থাকার ঘোষণা দিলেন। একজন কিশোর ছিলেন তিনি, আর সেখানে জাহেলি সমাজের সব হর্তাকর্তা উপস্থিত। চিন্তা করে দেখুন, কতটা সাহস থাকলে এভাবে কথা বলা যায়। যদিও তাঁর এ ঘোষণার পরও কুরাইশ নেতাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না; বরং তারা যে যার ঘরে চলে গেল। এ ঘটনার পর থেকেই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের অপমান করতে শুরু করলেন।

কিন্তু রাসূল (সা.) এসব অপমানের কারণে এক মুহূর্তের জন্য থেমে যাননি; বরং তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি শহরের প্রসিদ্ধতম পাহাড় সাফায় আরোহণ করলেন এবং চিৎকার করে সবাইকে ডাকলেন। যারা তখন বাজারে বা রাস্তাঘাটে ছিল, সবাই কৌতূহলী হয়ে তাঁর কথা শোনার জন্য সাফা পাহাড়ের নিচে এসে সমবেত হলো। তখন মুহাম্মাদ (সা.) বললেন—'হে আমার কুরাইশ সদস্যরা! যদি আমি বলি—এই পাহাড়ের পেছনেই শত্রুপক্ষের একটি বাহিনী লুকিয়ে আছে, যারা আপনাদের ওপর আক্রমণ চালানোর পাঁয়তারা করছে, আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?'

[৪] সূরা হিজর : ৯৪

নতুন যুগে প্রবেশ

একটু ভাবুন তো : *মক্কাবাসীরা যখন টের পেল মুহাম্মাদ (সা.) তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছেন, তখন তারা ভাবল—খুব শীঘ্রই তাঁকে ধরে ফেলবে। কিন্তু নবিজির সাথে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যারা তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত। সবচেয়ে বড়ো কথা—তাঁর পাশে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ ছিলেন। আর যে কারও জন্য আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম সুরক্ষাকারী ও নিরাপত্তাদানকারী।*

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—মদিনাবাসী কেন নবিজিকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং কীভাবে জানিয়েছিল।

সাওর পর্বতের ঘটনা

রাসূল (সা.) হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর কুরাইশ নেতারা একজোট হয়ে চিৎকার করে নিজেদের রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকল। যারা নবিজিকে হত্যা করতে গিয়েছিল, তারাও এই হত্যা মিশনে ব্যর্থ হয়ে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওই রাতেই তারা মক্কার নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকায় নবিজিকে পাকড়াও করার জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিলো।

নবিজি ও তাঁর হিজরতের সঙ্গী আবু বকর (রা.) মক্কার দক্ষিণে 'সাওর' নামক একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। খুব বেশি লোক এই গুহাটি সম্পর্কে জানত না। তবে আবু বকর (রা.)-এর বিশ্বস্ত ভ্রমণ গাইড আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত এ গুহার বিষয়ে জানতেন। উরাইকিত এই সাওর গুহায় নবিজি ও আবু বকর (রা.)-কে রেখে উটগুলো নিয়ে নিজে আড়ালে একটি স্থানে চলে গেলেন।

আবু বকর (রা.)-এর দুই মেয়ে আসমা ও আয়িশা (রা.), ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) এবং পারিবারিক খাদেম আমির এই গুহায় তাঁদের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে অবগত ছিলেন। আবদুল্লাহ সারাদিন কুরাইশদের গতিবিধি ও প্রতিক্রিয়ার খবর সংগ্রহ করতেন আর সন্ধ্যা নামলে বোন আসমাসহ এই খবরগুলো নিয়ে নবিজিকে দিতেন। খবর দেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা খাবারও নিয়ে যেতেন।

আমির দিনে এই গুহার আশপাশের এলাকায় মেষ চরাত, যেন গুহার আশপাশের মানুষের পায়ের ছাপগুলো মাটির সাথে মিশে যায়। নবিজি ও আবু বকর (রা.) তিন দিন ওই গুহায় অতিবাহিত করলেন। নবিজি এই তিন দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকলেন। এর মধ্যে এক বিকেলে কুরাইশদের কিছু অনুসন্ধানকারী গুহার একেবারে কাছে চলে এলো। সেখানে একজন মেষপালককে দেখতে পেয়ে তারা জানতে চাইল—আদৌ তার চোখে সন্দেহজনক কিছু পড়েছে কি না। মেষপালক বলল—'তার চোখে কিছুই পড়েনি, তবে তারা চাইলে গুহার ভেতরটি দেখে আসতে পারে।'

মেষপালক যখন এসব বলছিল, তখন আবু বকর (রা.) গুহার ভেতর থেকে তা শুনছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর নিরাপত্তার কথা ভেবে খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। গুহার ভেতর একটি কোনায় গিয়ে তিনি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুই-একজন অবশ্য গুহার একেবারে মুখে এসেও ফিরে গেল।

পরে তাদের সঙ্গীরা যখন জানতে চাইল—কেন তারা গুহার ভেতর প্রবেশ করল না, তখন তারা জানাল—গুহার মুখে মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা রয়েছে। মাকড়সার জাল দুই-তিন দিনে তৈরি হয় না। তাই কেউ যদি এ সময়ে গুহায় প্রবেশ করত, তাহলে জালটাও ছিঁড়ে যেত আর কবুতরগুলোও ভয়ে উড়ে যেত।

গুহার ভেতর আবু বকর (রা.) ফিসফিস করে নবিজিকে বলছিলেন—'ওদের কেউ ভালোমতো গুহার ভেতর তাকালে হয়তো আমাদের দেখে ফেলবে।' নবিজি এ কথাটি শুনে বললেন—'হে আবু বকর! তুমি কীভাবে আমাদের দুজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে পেরেশান হও, যেখানে তৃতীয়জন হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন?' তখন তাঁরা দেখলেন—কাফিররা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে কেউ নেই ধরে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। আবু বকর (রা.) বলে উঠলেন—'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার!'

ইয়াসরিব যাত্রা

একটানা তিন দিন মক্কার আশপাশে সর্বত্র তন্নতন্ন করে খোঁজার পরও সফল না হয়ে কাফিররা তল্লাশি অভিযান স্থগিত করল। যখন আবদুল্লাহ এ খবরটি নবিজি ও তাঁর পিতাকে জানালেন, তখন তাঁরা পুনরায় ইয়াসরিবের উদ্দেশে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খবর পেয়ে আবু বকর (রা.)-এর খাদেম আবারও উটগুলো নিয়ে গুহার মুখে চলে এলো।

আসমা (রা.) কয়েকদিনের খাবার নিয়ে এলেন, কিন্তু এ খাবারগুলো উটের পিঠে বাঁধার মতো কোনো দড়ি তাঁদের কাছে ছিল না। তাই আসমা (রা.) নিজের পোশাকে অতিরিক্ত যে কোমড়বন্ধনী পরেছিলেন, তা খুলে দুই টুকরো করে এর একটি টুকরো দিয়ে খাবারগুলোকে উটের সাথে বেঁধে দিলেন। এ ঘটনার পরই আসমা (রা.)-এর একটি উপাধিই হয়ে যায়—'দুই কোমড়বন্ধনী বিশিষ্ট নারী।'

নবিজির সাথে থাকা পথপ্রদর্শক মরুভূমির রাস্তা চেনায় খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁদের নিয়ে আরও দক্ষিণের দিকে চলে গেলেন। তারপর পশ্চিমের একটি পাথরময় রাস্তা ধরে উত্তরে ইয়াসরিবের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এভাবে তাঁরা তুলনামূলক কম পরিচিত রাস্তা বেছে নিলেন।

কেননা, মক্কাবাসী এরই মধ্যে নানাস্থানে জানিয়ে দিয়েছিল—কেউ যদি মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাকড়াও করতে পারে, তাহলে তাকে ১০০টি উট পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রচণ্ড লোভনীয় এই পুরস্কারটি পাওয়ার জন্য শুধু মক্কা নয়; বরং এর আশপাশের গোত্রের লোকেরাও মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়েছিল।

মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত একটি বেদুইন গোত্রের এক যোদ্ধার নাম ছিল সুরাকা। কোনো একটি সূত্র থেকে তার কানে এলো—দক্ষিণের পার্বত্য এলাকায় তিনটি লোককে দেখা গেছে। সুরাকা একাই কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কারগুলো পেতে চেয়েছিল। তাই সে অন্যদের তল্লাশি অভিযানে বের হওয়া থেকে নিবৃত করল। তাদের বলল—যাদের দেখা গেছে, তাঁদের সে চেনে। সেখানে মুহাম্মাদ বা তাঁর সঙ্গী কেউ নেই। তাই এ বিষয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সে নিজের মনে তখন ঠিকই সন্দেহ করেছিল—খুব সম্ভবত এই তিনটি লোকই হলো মক্কা থেকে পালিয়ে আসা তিনজন, যাদের মাথার বিনিময়ে বড়ো ধরনের পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। তাই অন্যদের বিরত করে সে কিছু সময় পর দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকার দিকে চলে গেল।

ওই এলাকায় কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর একটা পর্যায়ে সুরাকা রাসূল (সা.)-ও তাঁর সঙ্গীদের দেখতে পেল। সে তখন তার ঘোড়ার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সেটি আর এক পা-ও এগোলো না; বরং বালিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যখন আরেক দফা চেষ্টা করল, তখন ঘোড়াটি ঝটকা মেরে উলটো তাকেই মাটিতে ফেলে দিলো।

সে কোনোরকম ঘোড়ার আসনের ওপর বসে আরেক দফা চেষ্টা করল, কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো। ঘোড়ার পা বালিতে ডেবে গেল। তখন বুঝতে পারল— অন্য কোনো অপার্থিব শক্তি এখানে কাজ করছে, যা তাকে সামনে এ গোতে দিচ্ছে না। তখন সে নবিজির বহরকে ডাকল।

একটি শহরের পুনর্নির্মাণ

একটু ভাবুন তো : *এর আগে মদিনা ছিল একটি বিভক্ত শহর। এ শহরের প্রধান দুই গোত্র আওস ও খাজরাজ অসংখ্যবার যুদ্ধে মিলিত হয়েছে। আর ইহুদিরা এ দুই গোত্রের ওপরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। সব মিলিয়ে মদিনায় গৃহযুদ্ধের একটি আবহ বিরাজ করছিল। ইসলামের আগমনের পর গোটা শহর শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে এলো। নাগরিকরা স্বস্তিবোধ করতে শুরু করলেন। এটিই হলো দ্বীন ইসলামের নিয়ামত।*

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—কীভাবে নবিজি এ শহরটি পরিচালনা করেছিলেন।

রাসূল (সা.) যখন নেতা

মদিনার সকলেই বুঝতে পারছিল—রাসূল (সা.)-ই এ শহরের নতুন নেতা হতে যাচ্ছেন। যেভাবে শহরে আগমনের পর থেকেই নবিজি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে এ বিষয়টা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কারণ, প্রতিদিনই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটছিল এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছিল। অবস্থাদৃষ্টে বোঝাই যাচ্ছিল—মুসলিমরা মদিনায় এসে তাঁদের দ্বীনি কাঠামোর একটি ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে।

রাসূল (সা.) মদিনায় প্রবেশ করেই যে কয়েকটি কাজ একেবারে শুরুতে করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো—মুসলিমদের সাথে মদিনায় বসবাসরত অন্য ইহুদিদের চুক্তি। বলাই বাহুল্য, অন্য সব মদিনাবাসীর মতো ইহুদিরাও নবিজির মদিনায় আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল। কারণ, তাদের প্রত্যাশা ছিল নতুন নবি তাদের ধর্মেরই নবি এবং তিনি ইহুদিদের সাথেই যোগ দেবেন। চুক্তিটি দুই পক্ষের স্বার্থ চিন্তা করেই প্রণীত হয়েছিল এবং ইহুদি ও মুসলিম উভয়েই চুক্তি মানার ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেছিল। এ চুক্তির প্রধান বিষয়গুলো ছিল—

১. যারা বিদ্রোহ করবে কিংবা শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে, তাদের মোকাবিলায় মদিনায় বসবাসরত সকল পক্ষ একাট্টা হয়ে লড়াই করবে।

২. বাইর থেকে কোনো শত্রু আক্রমণ করলে তাদের প্রতিরোধে মুসলিম ও ইহুদিরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।

৩. মদিনায় যে অমুসলিমরা আছে, তারাও নিজেদের জীবন ও সম্পদ ভোগ করার সমান অধিকার লাভ করবে।

৪. ইহুদি ও মুসলিম প্রত্যেকেই একে অপরের অধিকার ও জীবনযাত্রাকে সম্মান করবে।

৫. কোনো গোত্র নবিজির অনুমোদন ছাড়া বাইরের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

৬. বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় যে খরচ হবে, তা ইহুদি ও মুসলিম সমানভাবে বহন করবে।

৭. মদিনার কেউ মক্কার কুরাইশ বা তাদের কোনো মিত্রের সাথে মিত্রচুক্তি করতে পারবে না।

চুক্তিগুলো একনজর দেখলেই বোঝা যায়—এর মধ্য দিয়ে মদিনায় বসবাসকারী সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছিল। তা ছাড়া চুক্তির মূল পয়েন্টগুলোর বাইরেও প্রতিটি পক্ষের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের বিষয়ে করা হয়েছিল বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এ চুক্তিকে ইতিহাসবিদগণ পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

রাসূল (সা.) অবশ্য আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী নাজরান এলাকায় বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সাথেও চুক্তি করলেন। আরও অনেক বিষয়ের সাথে এ চুক্তিতে মৌলিক যে বিষয়গুলো ছিল, তা হলো—

১. খ্রিষ্টানদের নিজেদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষিত করার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আছে এবং মুসলিমদের এই অধিকারকে সম্মান দিতে হবে।

২. কোনো চার্চের ক্ষতি কিংবা যাজকদের কাজে বাধা দেওয়া যাবে না।

৩. মুসলিমরা যদি শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে মুসলিম সেনাদের সহায়তা করার জন্য খ্রিষ্টানদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

৪. খ্রিষ্টানদের ধর্মচর্চায় কোনো মুসলিম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

রাসূল (সা.) আরবের পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত জরথুস্ত্রদের সাথেও চুক্তি করলেন। এ চুক্তির মূল বিষয়গুলো ছিল—

১. জরথুস্ত্রদের নিজেদের মতো করে সম্পদ ও জীবন উপভোগ করার অধিকার থাকবে।

২. তারা তাদের প্রয়োজনমতো কূপ ও মেষ চরানোর জন্য যেকোনো স্থান বেছে নিতে পারবে।

৩. তাদের মন্দিরগুলোর কোনো ক্ষতি করা হবে না এবং ধর্মীয় আচারাদি পালনে বাধা দেওয়া যাবে না।

৪. ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসেবে তারা যেকোনো পুরোনো সংস্কৃতি ধারণ ও অনুশীলন করতে পারবে।

আবারও ঝড়ের পূর্বাভাস

একটু ভাবুন তো : *তখনও পর্যন্ত ইসলামের পক্ষের শক্তির যতজন মিত্র ছিল, তার চেয়ে শত্রুর পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। মদিনা মুসলিমদের জন্য নিরাপদ আবাসন ছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানে শত্রুপক্ষের অনেকেরই বসবাস ছিল। মদিনা শহরের প্রান্তের কিছু ভূখণ্ডে যেমন মুসলিমদের মিত্রদের নিয়ন্ত্রণ ছিল আবার এমন অনেক এলাকাও ছিল, যেখানে ইসলামবিরোধীদের আধিপত্যই বরং বেশি। এ কারণে সমস্যা ও সংকট যেন অনেকটা প্রত্যাশিতই ছিল।*

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—মুসলিমরা কীভাবে বনু নাজির ও মুনাফিকদের চক্রান্ত এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো।

যুদ্ধপরবর্তী প্রতিক্রিয়া

কেন মুসলিমরা উহুদের যুদ্ধে অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকার পরও জয়লাভে ব্যর্থ হলো—এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেছেন। মূলত অধিকাংশ মুসলিম জাগতিক সম্পদ বিশেষত গনিমতের মালামালের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি তারা নেতার হুকুম অমান্য করেছিল। আর নবিজির ইন্তেকালের গুজব শুনে অনেকের ঈমানও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

উহুদের বিপর্যয় মুসলিমদের মাঝে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলল। অনেক মুসলিমই এরপর নিজেদের জন্য ক্ষমা ও শক্তি প্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে দুআ করার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। অন্যদিকে, মুনাফিকরাও খুব দম্ভভরে বলতে লাগল—যদি মুসলিমরা তাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে তাড়িয়ে না দিত, তাহলে এত মুসলিমকে কখনোই মরতে হতো না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব প্রচারণার উত্তরে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন—

> ‘যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে— এটা কোথা থেকে এলো? তাহলে বলে দাও—এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।’[৫]

[৫] সূরা আলে ইমরান : ১৬৫

আল্লাহ আরও বলেন—

> ‘ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে—যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না। তাদের বলে দিন—এবার তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা নিজেদের রবের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।’[৬]

এই দুটি আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন—প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর যখন সময় এসে যাবে, তখন ওই ব্যক্তি যদি যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে ঘরেও বসে থাকে, তারপরও তার মৃত্যু হবে। কেউই মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না। তাই যারা অলস না থেকে বরং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আল্লাহর হুকুম কায়েমের জন্য প্রয়াস চালায় বা জীবন উৎসর্গ করে, তারাই আল্লাহর কাছ থেকে পরকালে উত্তম পুরস্কার লাভ করবে।

সাহাবিদের শাহাদাত

উহুদ যুদ্ধের পর আরবের নানা প্রান্তে বসবাসকারী গোত্রগুলো ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছিল—মুসলিমরা একেবারেই অজেয় নয়; তাদেরও পরাজিত করা সম্ভব। এরই মধ্যে বনু আমর গোত্রের প্রধান আবু বুরা মদিনায় এসে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলো—সে তার এলাকায় মুসলিমদের ইসলাম প্রচারের সুযোগ দেবে। সে রাসূল (সা.)-কে অনুরোধ করল, যেন তার জনপদে কিছু সাহাবিকে প্রেরণ করা হয়—যারা গিয়ে বনু আমরের লোকজনকে ইসলাম শিক্ষা দেবেন।

রাসূল (সা.) তখন আবু বুরার সাথে ৭০ জন সাহাবিকে প্রেরণ করলেন। ‘বীরে মাউনা’ নামক একটি স্থানে পৌঁছার পর মুসলিমদের ঘেরাও করে বনু আমরের লোকেরা ৭০ জন সাহাবিকে হত্যা করল। একজন মুসলিম সাহাবি এ ঘটনায় বেঁচে গেলেন। কারণ, তিনি মৃত্যুর অভিনয় করেছিলেন। তিনিই মদিনায় ফিরে এসে নবিজিকে এই গণহত্যার বিষয়ে অবহিত করলেন। মুসলিমরা একসাথে এতজন সাহাবিকে হারানোর ঘটনায় মুষড়ে পড়লেন।

---

[৬] সূরা আলে ইমরান : ১৬৮-১৬৯

দায়িত্বের পরিসমাপ্তি

একটু ভাবুন তো : খুব পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাধনার পর যখন একটি কাজের সফল পরিসমাপ্তি হয়, তখন কিছু লোক পুরো সফলতার কৃতিত্ব ছিনতাই করে নিতে চায়; যদিও মূল কাজের ব্যাপারে কখনোই তাদের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা থাকে না। তারা উড়ে এসে জুড়ে বসে সুনামের ভাগীদার হতে চায়। ইসলামের বিজয় নিশান ওড়ার পর সেখানেও একই ঘটনা ঘটল। কিন্তু আল্লাহ এই ধোঁকাবাজ ও চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিলেন।

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে অভিযান যেভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল।

পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ

হজ পালন শেষে মদিনায় ফিরে এলেন রাসূল (সা.)। এরপর ঘোষণা করলেন—কোনো অমুসলিম আর পবিত্র শহর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। রহিত করলেন জাহেলি পদ্ধতিতে হজ করার বিধানও। এরপর এই ঘোষণাগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি হুকুম জারি করলেন।

রাসূল (সা.) তাঁর নিজের ও আশপাশের গোত্রের মানুষদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনতে ছিলেন দারুণভাবে সফল। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর হাতে তৈরি সাহাবিগণও বিরাট বিরাট অঞ্চল জয় করতে থাকলেন, সেখানে বসবাসরত মানুষদের কাছে পৌঁছে দিলেন ইসলামের সুমহান বাণী। কুরআন নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়াও তখন কমে আসছিল।

অগণিত সাহাবি কুরআনের নাজিলকৃত আয়াতগুলো মুখস্থ করেছিলেন, লিখে রেখেছিলেন। তাঁরা একে অপরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া অব্যাহত রাখলেন। এভাবে একটি পুরো প্রজন্ম মুসলিম ও দৃঢ়চেতা ঈমানদার হিসেবে তৈরি হয়ে গেল। আবার মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া প্রথম প্রজন্মও ততদিনে চলে এসেছে।

উদাহরণ হিসেবে আলি (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর কথা বলা যায়। তাঁরা জন্মেছিলেন মুসলিম পরিবারে। মসজিদে এবং পরিপূর্ণ ইসলামি পরিবেশেই তাঁদের চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের নানা রাসূল (সা.)-এর কোলে-পিঠে উঠে খেলাধুলা করেছেন; এমনকি নবিজি সিজদা দেওয়ার সময়েও তাঁরা তাঁর কাঁধে চড়ে বসতেন।

ইসলাম ততদিনে পৌঁছে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। এই অবস্থান থেকে ইসলামের পড়ে যাওয়ার কিংবা বড়ো কোনো বিপদ হওয়ার শঙ্কাও অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছিল। নবিজির বয়স

তখন ৬৩। এই বয়সে এসে তিনি আবারও উত্তর আরবের দিকে নজর দেওয়ার চিন্তা করলেন। কেননা, সেখানে তখন পর্যন্ত বাইজেন্টাইন ও পারস্য বাহিনী মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল।

রাসূল (সা.) এই অবস্থায় বড়ো একটি বাহিনী তৈরি করে ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশনা দিলেন, যেন বাইজেন্টাইনদের সমস্যাটির স্থায়ীভাবে সমাধান করা যায়। এ যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে নবিজি নবীন প্রজন্মের একজনকে বাছাই করলেন; যার বয়স ২০ বছরও হয়নি। এই সেনাপতির নাম উসামা বিন জায়েদ (রা.)। তাঁর বাবা ছিলেন প্রথম দিকের সাহাবি জায়েদ বিন হারিসা (রা.); যিনি এর আগে মুতার যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে শহিদ হন। আর মা ছিলেন রাসূল (সা.)-এর পালক মা ও সেবিকা উম্মে আইমান।

রাসূল (সা.) উসামা (রা.)-কে এই অভিযানের বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশনাও প্রদান করলেন। উসামা (রা.) শুরু করে দিলেন তাঁর বাহিনী গঠনের কাজ। এর দু-এক দিন পরই অসুস্থ হয়ে পড়লেন নবিজি। তাঁর কার্যক্রম অনেকাংশেই সীমিত হয়ে গেল। মুসলিমরা তখন নবিজির স্বাস্থ্য নিয়ে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন।

ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে লড়াই

আরব্য উপদ্বীপের কিছু পথভ্রষ্ট ও বিকৃত চিন্তার মানুষ নবুয়তকে ক্ষমতা ও সম্পদ উপার্জনের সহজ পথ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করল। তারা নিজেদের নবি বলে দাবি করতে লাগল। আর এই লোকগুলো মক্কা থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে বাস করার সুবাদে স্থানীয় মানুষদের তাদের কথায় দুর্বল করতে সক্ষম হলো। তাদের ব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিতে শুরু করল তারা।

এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল তুলাইহা। সে একবার মরুভূমিতে হঠাৎ করেই একটি পানির কূপ আবিষ্কার করল এবং এরপর থেকে দাবি করতে শুরু করল—এই পানির কূপটিই তার নবুয়তের নিদর্শন। কিন্তু রাসূল (সা.)-কে সরাসরি মোকাবিলা করার সাহস তার ছিল না। তাই রাসূল (সা.) জীবিত থাকা অবধি তুলাইহা চুপ থাকল।

তাঁর ওফাতের পর সে প্রকাশ্যে নবুয়তের ঘোষণা দিলো এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তুলাইহাকে দমন করতে প্রেরণ করা হলো খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে। খালিদ (রা.) তাকে পরাস্ত করলেন এবং বাকি জীবন তুলাইহা মুসলিম হিসেবেই অতিবাহিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি পেল।